

মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন কীভাবে হবে?

আজ - কাল - পরশু

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর



আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার শেষ নেই। এটা যে কোনো রাজনৈতিক সমালোচনা, তা নয়। দল-মতনির্বিশেষে দেশের সব শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তি যাত্রাই মনে করেন দেশের সর্বস্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় নানা রকম ত্রুটি রয়েছে। একেবারে ত্রুটিহীন কোনো শিক্ষাব্যবস্থা বাংলাদেশে কোনো সরকার চালু করতে পারবে, তা আশা করা যায় না। আমাদের সেই দক্ষতা বা সামর্থ্যও নেই। তবে শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি থেকে যাবে, এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। একটি দল পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকে। বর্তমান সরকার দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় রয়েছে, বাংলাদেশে যা ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রম নানা ইতিবাচক পরিবর্তন আনার সুযোগও করে দিয়েছে। কিন্তু সরকার কি শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই সুযোগ নিচ্ছে? কয়েক দিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের কয়েকজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এই সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। উদ্যোগটি খুব প্রশংসনীয়। শিক্ষামন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের আমলারা বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন বিষয়ে পরামর্শ চেয়েছেন। পরামর্শ কতটা তাঁরা গ্রহণ করবেন, সেটা একটা প্রশ্ন বটে। কিন্তু পরামর্শ তাঁরা শুনেছেন এবং পরামর্শগুলো মিডিয়ায় প্রচারিত হয়েছে, তার গুরুত্বও কম নয়। অন্য কোনো মন্ত্রণালয়কেও এরকম পরামর্শ গুনতে দেখা যায় না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত সেমিনারে বিশেষজ্ঞরা মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে যা বলেছেন, তা মোটেও নতুন কথা নয়। বিভিন্ন সেমিনারে, লেখায়, টিভির টক শোতে এসব কথা এক দশক বা তারও বেশি সময় ধরে বলা হচ্ছে। কী সেই কথা? একনজরে দেখা যাক মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রধান ইস্যু কী কী। ১) মাধ্যমিক শিক্ষার আমূল সংস্কার করতে হবে, ২) কোটিং বন্ধ করে স্কুল শিক্ষাকে আরও কার্যকর করতে হবে, ৩) পাঠ্যবইয়ের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে গাইড বই বন্ধ করতে হবে, ৪) স্কুল পাঠ্যবই আরও সহজ-সরল ভাষায় লিখতে হবে, ৫) প্রতিটি পরীক্ষা থেকে এমসিকিউ পদ্ধতির প্রশ্ন বাতিল করতে হবে, ৬) সৃজনশীল পদ্ধতি কার্যকর করার জন্য শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে, সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য প্রশংসাপত্র গঠন করতে হবে, ৭) মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে হবে, ৮) পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির যেকোনো একটি পাবলিক পরীক্ষা রাখতে হবে। পরীক্ষা আর পরীক্ষা দিয়ে

শিক্ষার্থীদের ভারাক্রান্ত করা যাবে না, ৯) পরীক্ষা ও প্রশ্ন প্রণয়নের পদ্ধতি পর্যালোচনা করতে হবে। ১০) কারিকুলাম অযথা ভারী করা হয়েছে, ১১) পাঠ্যবইকে আরও উন্নত, নির্ভুল ও আকর্ষণীয় করতে হবে, ১৩) যোগ্য ও দক্ষ লোককে শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার জন্য বেতন ও অন্যান্য সুবিধা বাড়াতে হবে ইত্যাদি। আগ্রহী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা হয়তো আরও কিছু বিষয় যোগ করতে পারবেন। তবে মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে এগুলোই প্রধান ইস্যু। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত সেমিনারে পুরোনো ইস্যুগুলোই ঘুরেফিরে এসেছে। এতে প্রমাণিত হয় যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের দুই মেয়াদে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারেনি। যদি সমাধান করতে পারত, তাহলে বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা একই সমস্যার কথা আবার তুলতেন না। সেমিনারে আলোচকদের তালিকা থেকে দেখা যায়, একজন আলোচকও বিএনপি-জামায়াতপন্থী নন। অর্থাৎ তাঁরা সরকারকে হেয় বা বিব্রত করার জন্য এসব কথা বলেননি। তাঁরা সরকারের বন্ধু বলে বাস্তব অবস্থার আলোকে ইস্যুগুলো তুলে ধরেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি এই ইস্যুগুলোর কথা আগে শোনেনি? গত আট বছরে শোনেনি? যদি শুনে থাকে-বা প্রতিক্রিয়া পড়ে থাকে, তাহলে সমাধানের উদ্যোগ নেয়নি কেন? সব সমস্যার সমাধান সরকারের এক বা দুই চার্মে করে ফেলবে, তা আমরা আশা করতে পারি না। কিন্তু উল্লিখিত তালিকার কটি সমস্যার সমাধান মন্ত্রণালয় করেছে, তা সেমিনারে জানানো উচিত ছিল। শুধু পরামর্শ শোনা শিক্ষামন্ত্রী ও আমলাদের কাজ নয়। এ ধরনের সেমিনার এর আগেও হয়েছে। পরামর্শ বাস্তবায়ন করা মন্ত্রীর কাজ। অজ্ঞত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে।

শিক্ষামন্ত্রী যদি মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে সত্যি সত্যি আগ্রহী হন, তাহলে তাঁকে আরও কিছু কাজ করার জন্য প্রস্তাব দেব। ২০১৬ সালকে তিনি 'পরামর্শ শোনার বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা দিন। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে নির্বাচিত প্রধান শিক্ষক, প্রবীণ শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ,

অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে দিনব্যাপী আলোচনা করুন। মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রধান সমস্যা কী কী, তাঁদের কাছে শুনুন। এভাবে আটটি সেমিনার করলে তিনি মোটামুটি একটা ধারণা পেতে পারেন। আটটি বিভাগীয় শহরের পাশাপাশি আরেকটি সেমিনারে শিক্ষার্থীদের মতামত শুনুন। শিক্ষামন্ত্রীকে সব সেমিনারে উপস্থিত থাকতে হবে, এমন কোনো শর্ত নেই। তাঁর দরকার সারা দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ প্রতিবেদন। ২০১৬ সালে এই কর্মসূচি সম্পন্ন হলে আর পরামর্শ শোনার দরকার নেই। এবার বাস্তবায়নের পালা।

এই পরামর্শের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১০টি ইস্যু অগ্রাধিকারভিত্তিক নির্বাচন করতে পারে। এই ১০টি ইস্যু নিয়ে সমাধানভিত্তিক কাজ করার জন্য ১০টি সাব-কমিটি করে দিন। এই সাব-কমিটি তিন মাস আলোচনা-আলোচনা করে সমাধানের রূপরেখা তৈরি করতে পারে। এবার সেই রূপরেখা নিয়ে আবার জাতীয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে একদিন মতবিনিময় হতে পারে। সেটাই আপাতত শেষ আলোচনা। তারপর মন্ত্রণালয় সমাধানের রূপরেখা ও জাতীয়ভিত্তিক আলোচনায় পাওয়া মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করবে এবং বাস্তবায়ন শুরু করবে। যে সাব-কমিটি 'সমাধানের রূপরেখা' প্রণয়ন করবে, তারাই মনিটর করবে বাস্তবায়নে। কোথাও সমস্যা হলে তা সমাধানের পরামর্শ দেবে। এই মনিটরিং খুব গুরুত্বপূর্ণ। মনিটরিংয়ের অভাবে আমাদের অনেক ভালো কাজ ভেঙে যায়।

একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা এসব সাব-কমিটি করতে পারবে না। তা হলো শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধি। সেটা না হলে আবার অনেক সুপারিশই বাস্তবায়ন করা যাবে না। বাজেট বৃদ্ধি হলো আসল কথা। অনেক সুপারামর্শ শুধু অর্থের অভাবে বাস্তবায়ন করা যায় না। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা, অর্থমন্ত্রী সবাইকে পর্যালোচনা করতে হবে। কোন খাতে

বরাদ্দ কমিয়ে কোন খাতে বরাদ্দ বাড়ানো যায়, তা নিয়ে গঠনমূলক তর্ক করতে হবে। এই তর্কে অনেক অগ্রিয় প্রসঙ্গও আসতে পারে, তা-ও গুনতে হবে। প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভাকে দেশের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে হবে। বাংলাদেশ যে বন্ধুবেষ্টিত একটি দেশ, সেই বাস্তবতা বুঝতে হবে। এই বাস্তবতালগ্নো উপলব্ধি করতে পারলে সরকার বাজেট বরাদ্দ নিয়ে একটা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। বাজেট বরাদ্দ নিয়ে কোনো ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে মাধ্যমিক শিক্ষা ইস্যুতে অনেক সিদ্ধান্ত বা সুপারিশ বাস্তবায়ন করা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সম্ভব হবে না।

আরও একটি প্রশ্নের অবতারণা করা দরকার। আমাদের বেশির ভাগ সরকারি কাজ রাজনীতি দ্বারা বিভাজিত। এ জন্য আমরা অনেক ব্যক্তির জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। তাতে সরকার বা দেশ লাভবান হচ্ছে না। শুধু দলীয় পরিচয়ের জন্য অনেক অদক্ষ বা মাঝারি মেধার ব্যক্তিকে আমরা নানা সরকারি কাজে ব্যবহার করছি। ভিন্ন দলের সমর্থক বা দলনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের মানসম্পন্ন সেবাও মন্ত্রণালয় নিচ্ছে না। সরকারি দলের মূখ্য লোকজনও সরকারি কাজে পণ্ডিতের মর্যাদা পাচ্ছেন। এটা খালি চোখে দেখা যায়। সবাই তা দেখছেনও। এটা আমাদের সামগ্রিক রূপণ রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ। গত আট বছরেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে কোনো সমস্যারই সমাধান করতে পারেনি, তার কারণ বেশির ভাগ কাজে দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের সহায়তা না নেওয়া। পাঠ্যবই নিয়ে যে আজ এত অভিযোগ, তার কারণও এটাই। এ রকম দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জাতীয় কাজ করতে চাইলে তার ফল এ রকমই হবে।

শিক্ষামন্ত্রী যদি নতুন উদ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে কাজ শুরু করতে চান, তাহলে সাব-কমিটি গঠন, পাঠ্যপুস্তকের লেখক, বিশেষজ্ঞ নির্বাচন, জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে মতবিনিময়—সবখানে দল-মতনির্বিশেষে দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিন। তাহলে ভালো ফল পাবেন।

আমরা মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে নানা কথা বলছি। কিন্তু আমাদের শিক্ষার মূল ভিত্তি তো প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা নিয়েও তো নানা সমালোচনা। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন না করে আমরা মাধ্যমিক শিক্ষার কথা ভাবছি কেন? এটাও তো ঠিক হচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করব তিনিও যেন আমাদের প্রস্তাবিত ফরম্যাট অনুযায়ী দেশব্যাপী আলোচনা ও মতবিনিময় করে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আমাদের শিক্ষা নিয়ে আমরা অনেক রাজনৈতিক বক্তৃতা করি, কিন্তু বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আলোচনায় বসলে দেখা যায় আমাদের সামগ্রিক শিক্ষার মান খুব দুর্বল। যে দেশ মধ্য আয়ের দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখে, সেই দেশের শিক্ষার মানও মধ্য আয়ের দেশের মতো হতে হবে। তার বিকল্প নেই।

● মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর: গণমাধ্যম ও উন্নয়নকর্মী।